শাইখ
আবু উমর
আস-সাইফ রহ.

জীবনচরিত

শাইখ ড. আব্দুল মুহসীন বিন জুব্বান আল-মাতিরী
মাওলানা হামিদুর রহমান

শাইখ আবু উমর আস-সাইফ রহ. জীবনচরিত

মূল

শাইখ ডঃ আবদুল মুহসীন বিন জুব্বান আল-মাতিরী

(লেখক শাইখের নিকটাত্মীয়-মামাতো ভাই ও অধ্যয়নকালের সহপাঠী)

অনুবাদ

মাওলানা হামিদুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

শাইখ আবু উমর আস-সাইফ রহ. জীবনচরিত

নামঃ শাইখ আবু উমর আস-সাইফ রহ. এর মূল নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাইফ আল-জাবের আলে বুয়েনাইন আল-খালিদী। তাঁর মোট চৌদ্দজন ভাইবোন ছিল। যাদের মধ্যে দুজন মারা গেছেন এবং বর্তমানে তাঁরা সাত বোন ও ছয় ভাই জীবিত আছেন। ভাইয়েরা হচ্ছেন যথাক্রমেঃ মোবারক, ইবরাহীম, ফাহাদ (যিনি মারা গিয়েছেন) অতঃপর আবু উমর, ফয়সাল, বদর ও আলী। তাঁর একজন বৈমাত্রেয় ভাই রয়েছেন, যার নাম হচ্ছে সাইফ।

তিনি খেলাধুলাপ্রেমী ছিলেন; বিশেষকরে ফুটবল খেলা। তিনি (সৌদি আরবের) কাইছুমাহ্ শহরের যুবকদের নিয়ে খেলার টুর্নামেন্ট গঠন করতেন এবং তিনিই সর্বদা টিম লিডার থাকতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خيارکم في الإسلام خيارکم في الجاهلية إذا فقهوا

“তোমাদের জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ইসলামেরও শ্রেষ্ঠ লোক; যখন তারা দ্বীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করে। (বুখারী: ৩৩৭৪)

যুবকদের অভ্যাস হিসেবে তিনি গানও শুনতেন।

হেদায়াত লাভের কারণঃ

তাঁর হেদায়াত লাভের কারণ হল, তিনি আকস্মিকভাবে কিছু অডিও শুনেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দাদাজান সাইফের রেখে যাওয়া পারিবারিক গ্রন্থাগারে “আল

জওয়াবুল কাফি” নামক একটি কিতাব পেলেন। তাঁর দাদা একজন হাফেজে কুরআন ও কাইছুমাহ্ শহরের মেয়র ছিলেন। কিতাবটি তিনি পড়লেন ও তা দ্বারা খুব প্রভাবান্বিত হলেন। কারণ আল জওয়াবুল কাফি কিতাবটি পুরোটাই পরিপূর্ণ ছিল গোনাহের পরিণাম সম্পর্কিত আলোচনায়। তাই যে কোন পাঠক কিতাবটি শেষ করা মাত্রই সে তার ও গোনাহের মাঝে বিশাল দূরত্ব অনুভব করতে থাকে। তিনি মসজিদে মসজিদে যেয়ে আল জওয়াবুল কাফি কিতাবটির সারাংশ নিয়ে আলোচনা করতেন। সুতরাং তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ইবনুল কাইয়িম রহ. এর কিতাবাদি তালাশ করতে লাগলেন। তখন তিনি “আল ওয়াবিলুছ ছইয়িব” কিতাবটি হাতে পেলেন। এর দ্বারা তিনি আরো বেশি প্রভাবান্বিত হলেন। অতঃপর “মাদারিজুস সালিকীন” এবং তারপর “তরিকুল হিজরাতাইন” পড়লেন। এ কিতাবটিকে তিনি প্রচুর পরিমাণে ভালবাসতেন। এমনকি তিনি “তরিকুল হিজরাতাইন” কিতাবটি বিশ বারেরও বেশী পড়ে শেষ করেছেন এবং কিতাবটিকে প্রায় মুখস্তই করে ফেলেছিলেন।

যুহদঃ

তিনি বেশি কাপড়-চোপড়, পোশাক-আশাক অপছন্দ করতেন এবং সেগুলোকে তিনি যুহদবিরোধী মনে করতেন। তিনি খাটের ওপর ঘুমানোকেও অপছন্দ করতেন এবং মাটিতে শুতে ও এ কথা বলতে পছন্দ করতেন যে, তা কিয়ামুল লাইলের জন্য অত্যাধিক সহায়ক। তিনি চামচ দ্বারা খানা খেতে এবং পাইপ ব্যবহার করে জুস পান করতে অপছন্দ করতেন। তাঁর একটি পিকআপ ৮৫ নিসান গাড়ি ছিল। তিনি তা সম্পূর্ণরুপে অকেজো হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি। এরপর তিনি একটি হাইলাক্স ৯৩ টয়োটা গাড়ি সংগ্রহ করেন, যা তিনি শীশানে হিজরত করার আগপর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। তিনি বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা পছন্দ করতেন না। এমনকি আমাদের পাশ দিয়ে একদিন ফোর্ড গ্র্যান্ড মারকুইসের সর্বশেষ মডেলের একটি গাড়ি অতিক্রম করলে তিনি বললেন- “আল্লাহ্ পানাহ!, খোদার কসম গাড়িটি যদি আমাকে হাদিয়াও দেয়া হয় তবুও আমি গ্রহণ করব না”।

ইলমঃ

তিনি কুরআনুল কারীম, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং কিছুসংখ্যক মতন (তথা কুদূরী, বেকায়া, হেদায়া, ইত্যাদি) মুখস্থ করেছিলেন। তিনি ইবনুল কাইয়িম রহ. এর প্রায় সকল কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অধিকাংশগুলোকেই মুখস্থ করে ফেলেছেন। উনাইযা শহরে থাকাকালীন এবং জামিআতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সৌদে পড়াশুনাকালে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীনের সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি কিছু কিছু মাসআলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য শীশান থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতেন। তখন আমি তাকে বলতাম, "আপনার কাছে কি মুগনী নেই? তিনি বলতেন, মুগনী তো একটি ছোট কিতাব"। যে ব্যক্তি তাঁর বার্তা পড়বে এবং তাঁর অডিও শুনবে সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পাড়বে যে, তাঁর ইলমি গভীরতা কতটুকু।

আল-কাছিম প্রদেশে থাকাকালীন দৈনন্দিন কার্য-তালিকাঃ

ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াতের জন্য বসা। অতঃপর জামিআয় যাওয়া। অতঃপর যোহরের নামাজের পর দুপুরের খাবার ও কাইলুলাহর জন্য সেখান থেকে ফিরে আসা। আসরের নামাজের পর রিয়াজুস সালিহীন পাঠ করার জন্য শাইখ ইবনে উসাইমীনের নিকট উপস্থিত হওয়া। অতঃপর পঠন ও মুতালাআ করার জন্য বাসায় ফিরে আসা। অতঃপর মাগরিবের নামাজের পর শাইখ ইবনে উসাইমীনের ক্লাস। অতঃপর এশার আজান হতে ইকামত পর্যন্ত শাইখের আরেকটি ক্লাস। অতঃপর এশার নামাজের পর শাইখের কিছু ছাত্রকে দরস প্রদান। অতঃপর আগে আগে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য বাসায় ফিরে আসা। অতঃপর কিয়ামুল লাইলের জন্য ফজরের আড়াই ঘন্টা আগে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া।

পরহেযগারীঃ

তিনি স্বল্প আহার এবং হালাল-হারামে তাহকিক খুব বেশি করতেন। সন্দেহজনক কোন জিনিস তিনি গ্রহণ করতেন না। এবং সদকা তো দূরের কথা ঋণও তিনি কখনো গ্রহণ করতেন না। তাঁর নিকট কোন হাদিয়া এলে অধিকাংশ সময় তিনি তা অপরকে হাদিয়া দিয়ে দিতেন। শাইখ উসাইমীনের ক্লাসে তিনি খুঁটির পিছনে বসতেন, যেন শাইখ তাকে না চিনেন। সুতরাং পুরা চারটি বৎসর তিনি এভাবেই খুঁটির পিছনে বসেছেন এবং শীশান থেকে শাইখের সাথে যোগাযোগ করা ব্যতিত শাইখ তাকে চিনতেন না।

স্বপ্নঃ

তিনি খুব বেশি স্বপ্ন দেখতেন, এমনকি তিনি দৈনিক দশটির কমে স্বপ্ন দেখতেন না। স্বপ্নগুলো হয়ে থাকত তাঁর কোন ভুলের ওপর সতর্ক করার জন্য বা কোন ধারণাকে শুধরানোর জন্য বা উপদেশ দান করার জন্য বা অন্য কোন কারণে। এটা এক বিরাট অধ্যায়, যার জন্যে ভিন্ন এক পুস্তিকা লেখা দরকার। তাঁর কিছু স্বপ্ন এমন থাকত, শ্রবণকারী অনেকক্ষেত্রে যা বিশ্বাস করত না।

ইবাদাতঃ

তাঁর ইবাদত ছিল আশ্চর্য প্রকৃতির। আমি আমার নিজের কথা বলছি- আমি তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে ইবাদত করতে দেখিনি। তিনি সোমবার, বৃহস্পতিবার ও আইয়ামে বীজগুলোতে রোজা রাখতেন। যদি কখনো এ দিনগুলোতে অসুস্থ থাকতেন তাহলে সেদিন রোজা রাখতেন না এবং অন্য আরেকদিন কাজা করে নিতেন। তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ সময়ে, যা প্রায় তিন ঘন্টার কাছাকাছি- এগারো রাকাআত কিয়ামুল লাইল পড়তেন। রুকু সেজদাকে আশ্চর্যজনকভাবে লম্বা করতেন। যখন তিনি সেজদা হতে মাথা তুলেন তখন তুমি দেখতে পাবে যে, মাটির এক বিশাল অংশ তার চোখের

অশ্রুতে ভেজা রয়েছে। আমি তাঁর সাথে দেড় বৎসর থেকেছি। যখন আমরা একসাথে থাকতাম তখন তিনি তাহাজ্জুদে তাঁর সাথে আমাকেও ডেকে দিতেন। একদিন তিনি আমাকে এ কথা বলে ডাকছিলেন যে, "ওঠ! ওঠ! আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছে, আজ আমরা মাহরুম হয়ে গেলাম, সময় শেষ হয়ে গিয়েছে"। আমি তখন মনে করেছিলাম যে, হয়তোবা আজান হয়ে গিয়েছে বা আজানের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি যে, এখনও দেড় ঘন্টা বাকি রয়েছে। সুতরাং তিনি মনে করতেন যে, দেড় ঘন্টা কিয়ামুল লাইল করার দ্বারা কেবল শাস্তিই মিলে। সে সত্যই বলেছে যে বলেছে-

سيئات المقربين حسنات الأبرار

"অন্তরঙ্গদের অপরাধ ধার্মিকদের জন্য পুণ্যের কাজ"।

আমাদের (আমার ও আবু ওমরের) এক আত্মীয় খরজ শহরে একটি মানসিক হসপিটালে ভর্তি ছিল। আমরা ছিলাম কাছিম প্রদেশে। আর কাছিম প্রদেশের ছাত্রদের অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গারের চেয়ে উষ্ণতর অপেক্ষা করত, যেন তাঁরা এই দুই দিন পড়াশোনার বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পাদন করতে পারে। যেমন- মতন মুখস্থ করা বা কিতাব পড়া বা কিতাবের সংক্ষিপ্তসার আয়ত্ত করা ইত্যাদি। তো তিনি আমাকে বললেন- "আমরা আমাদের খরজ শহরের আত্মীয়কে দেখতে যেতে চাচ্ছি এবং আমরা বৃহস্পতিবার ফজরের পর বেরিয়ে পড়ব। এতে দুটি ইবাদাত রয়েছে- আত্মীয়তা রক্ষা করা এবং অসুস্থকে দেখতে যাওয়া"। আমি তাঁকে বললাম- "আপনি জানেন আমরা বৃহস্পতিবার দিনটির কিভাবে অপেক্ষা করে থাকি। আর আমাদের আত্মীয় আমাদেরকে উপলব্ধি করতে পারেনা"। তিনি আমাকে বললেন- "ইলমের বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, মতন থেকে নয়। তুমি সওয়াবের আশাবাদী হও, আল্লাহ্ তোমাকে এর পরিবর্তে এমন কিছু দিয়ে দিবেন, যা তুমি কল্পনাও করোনি"। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তা মেনে নিলাম। সুতরাং আমরা বের হলাম এবং যখনই আমরা নামাজের জন্য কোন মসজিদে অবস্থান করতাম তখনই তিনি দাঁড়িয়ে নসিহত প্রদান করতেন। আমরা যখন খাবারের জন্য একটি হোটেলে

গেলাম তখন তিনি টেলিভিশন বন্ধ করার জন্য তাঁদের নিকট অনুমতি চাইতে গেলেন এবং একবার বন্ধ করালেন। তখন হোটেলে উপস্থিত সকলে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। আওয়াজ উচুঁ হয়ে গেলে তিনি তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন- “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য এবং দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। হামদ ও সালামের পর কথা হল, নিঃসন্দেহে আপনারা সকলে মুমিন এবং মুসলমান, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা বাছাই করেছেন তাঁর প্রদত্ত শরিয়ত ও রিসালাতকে বহন করার জন্য। আপনাদের পক্ষে শোভা পায় না নিজেদেরকে এ গোনাহে কলুষিত করা। আল্লাহর কসম! আপনারা যদি দেখতে পেতেন যে, কেয়ামতের দিন এ গুনাহের বীভৎস চেহারা ও ভয়াবহতা কেমন হবে, তাহলে তা হতে উদ্ধার করার কারণে আপনারা অবশ্যই আমাকে ধন্যবাদ জানাতেন...”। তিনি এ ধরণের কথা বলতে শুরু করলেন। অতঃপর মানুষ নীরব হয়ে গেল; কিন্তু তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন না; যতক্ষণ-না মানুষ বলেছিল- “আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আপনি হক্কের ওপর রয়েছেন”।

পরিশেষে আমরা আমাদের আত্মীয়র সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমাদের দেখে তার আনন্দ ছিল বাঁধভাঙ্গা। অতঃপর আমরা ফিরে এলাম। তখন আমি একটি বিস্ময়কর বিষয় উপলব্ধি করলাম। আর তা হচ্ছে- আমি এক পৃষ্ঠা সবক মাত্র একবার পড়ার দ্বারাই মুখস্থ করে ফেলতে লাগলাম। আমি তখন নিজেই বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, আমি নিজের ব্যপারে পূর্বে এটা নিশ্চিত করেছিলাম যে, আমার এক পৃষ্ঠা সবক পড়তে কমপক্ষে বিশ মিনিট সময় লাগে। অথচ এখন একবার পড়ার দ্বারাই তা আমার আয়ত্তে চলে আসছে। বিষয়টি আমি আবু উমরকে জানালে তিনি আমাকে বললেন- “আমি কি তোমাকে পূর্বেই বলিনি যে, ইলমের ভেতর সৎকর্মের একটি আলাদা বরকত রয়েছে”। আমি যদি সেই সৎকর্মগুলো চালিয়ে যেতাম তাহলে আমার পূর্বে যে পরিমাণ স্মরণশক্তি ছিল তা আবার ফিরে আসত।

আবু ওমরের আশ্চর্যজনক অভ্যাসগুলোর একটি হচ্ছে- তাঁকে কেউ اتق الله “আল্লাহকে ভয় কর” এ কথাটি বললে তিনি তা সইতে পারতেন না। কেননা তিনি তখন আর নিজের চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না। একদিন সকালে আমি এবং আবু ওমর

জামিআয় যাচ্ছিলাম। আমাদের পথটি উনাইযা বাজারের ওপর দিয়ে ছিল। সেখানে এক দোকানদার প্রত্যুষে দোকান খুলে টেপে কুরআন বাজাচ্ছিল। তখন টেপ এ আয়াত থেকে পড়া শুরু করে-

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন... (সুরা নিসাঃ ১)

যা শুনে তিনি উনাইযা থেকে জামিআয় পৌছা পর্যন্ত কাঁদেন। আর বারংবার শুধু এ কথাই বলছিলেন যে, “আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল, আমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করিনা, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত”।

বরং এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হল, আমি তাঁর বিবাহের সাক্ষীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমার পাশে বসে ছিল উকিল এবং সামনে বসে ছিল আবু ওমর। আর তাঁর পাশে তাঁর ভাই, অতঃপর মেয়ের ওলি। সুতরাং উকিল বিবাহের নৈতিক খুতবা দেওয়া শুরু করলেন এবং সুরা নিসার প্রথম আয়াত এবং সুরা আল ইমরান ও সুরা আহযাবের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন, যার সবগুলোই শুরু হয় إتق الله দিয়ে। আমার মাথা সে সময় অর্ধনমিত ছিল। তখন আমার স্মরণে এসে গেল যে, আবু ওমর তো এ সকল আয়াত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি হয়তবা এখন প্রভাবান্বিত হবেন না; কেননা তিনি এখন নিজের বিবাহে আনন্দের শৃঙ্গে রয়েছেন। তখন আমি আমার মাথা একটু একটু করে তুললাম ও তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখি যে, তা চোখের অশ্রুতে টইটম্বুর। তিনি চেহারা থেকে পানি মুছিলেন ও আস্তে আস্তে বলছিলেন- আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কথাঃ

তিনি খুব সীমিত কথা বলতেন। অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলতেন না। কথা বলার সময় এমন ধীরে ধীরে বলতেন যে, কেউ চাইলে তা গুণতে পারত। তিন স্বল্প হাসতেন এবং সর্বদা এ কথা বলতেন যে, বেশি হাসার দ্বারা অন্তর মরে যায়।

হিম্মতঃ

তিনি প্রতিটি ইবাদাতের ক্ষেত্রেই উচ্চ মনোবলের অধিকারী ছিলেন। সৎকর্মে অন্য কেউ তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাওয়াতে তিনি তুষ্ট হতে পারতেন না। তিনি জুমুআর দিন সর্বদা আগে আগে মসজিদে যেতেন।

একদিন তিনি আমাকে তাঁর পূর্বে মসজিদে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কখন থেকে মসজিদে রয়েছো? আমি বললাম- সূর্যোদয়ের পর থেকে। তিনি বললেনঃ কেন? আমি বললামঃ যেন উট সদকা করার সওয়াব আমি লাভ করতে পারি। সেদিনের পর থেকে আমি যত জুমুআর দিনই সূর্যোদয়ের পর মসজিদে প্রবেশ করতাম তাঁকে আমি আমার পূর্বে মসজিদে পেতাম।

শারীরিক সক্ষমতাঃ

তাঁর একটি চমৎকার স্বভাব ছিল। তিনি প্রতি সপ্তাহে বনে চলে যেতেন এবং কিছু সময়ের জন্য পাহাড়ে চড়ে পূনরায় ফিরে আসতেন। এর দ্বারা তিনি নিজের ফিটনেস ও কর্মদক্ষতাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন।

এই হচ্ছে তাঁর বিস্তৃত জীবন-বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ পরিমাণ এবং সমুদ্রের একটি ফোঁটা ও বাগানের একটি ফুল। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তাআলা সম্ভবত তাঁর আরও বিস্তারিত জীবন-চরিত লেখা আমার জন্যে সহজ করে দিবেন।

শীশানে শাইখের ইলমি খেদমতঃ

তিনি শীশানে শরয়ী বিচারবিভাগীয় ইনস্টিটিউট ও শরিয়া তত্বাবধান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেখানে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন ও বিচারকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে অবদান রেখেছেন। অতঃপর তিনি ইমাম শাফিয়ী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর তিনি (মুআসসাতুল হুদা আল খাইরিয়্যাহ) দাতব্য সংস্থা আল-হুদা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন, যা বিভিন্ন দাওয়াতী ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। তিনি মিডিয়া জগতের দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন, একটি রেডিও চ্যানেল তৈরি করেছেন এবং ককেশাস অঞ্চলে একটি টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শীশানের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে "আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ্" কিতাব এবং "আল ইরাক ওয়া গাজউস সালিব- দুরুস ওয়া তাআম্মুলাত" (ইরাক ও ক্রুসেড যুদ্ধ – পাঠ ও গবেষণা) এই শিরোনামে লেকচার সিরিজ। (শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহর আত-তাবরিয়া কিতাব থেকে সঙ্কলিত)

শাহাদাত বরণঃ

"ধাওয়াকারীরা তাঁকে সব দিক থেকে ঘিরে নেয়। তাঁরা তাঁর বিবি ও সন্তানকে হত্যা করে ফেলে; কিন্তু এর দ্বারা তিনি দুর্বলও হননি, মনোবলও হারাননি; বরঞ্চ তিনি সিদ্ধান্তহীনতায়ও ভুগেননি, পিছপাও হননি। বরং তিনি অস্ত্র নিয়ে শত্রুবহরে ঢুকে পড়েছেন এবং পাষণ্ড কাফেরদের হত্যা করে আপন চক্ষুদ্বয় শীতল করেই তারপর তা বন্ধ করেছেন।

এভাবে এই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুটি ছিল এমন এক শিক্ষা ও উপদেশ, যা তিনি লেখেছেন আপন রক্তকালি দ্বারা, যা আপনাকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে হাজার হাজার খণ্ড কিতাব পড়া থেকে। এবং তাঁকেও তাঁর শানে কাসীদা রচনা করা থেকে ও পৃষ্ঠা কালো করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে এমন এক বীরত্বপূর্ণ মহাকাব্য, যার কায়া হচ্ছে

একজন মানুষ; বরং খোদার কসম যিনি হচ্ছেন একটি জাতি। তিনি ইলমের দিকে অগ্রবর্তী হয়েছিলেন, আর মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা নিয়ে। তিনি জিহাদের পথে আগে বেড়েছিলেন, আর মানুষ প্রতিযোগিতা করে কাপুরুষতা অনুনয়-মিনতি ও জিহাদের প্রতি অনুৎসাহীত করা নিয়ে। তিনি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, আর মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুনিয়ার সামান্যতম আসবাব নিয়ে। তিনি দুইটি উত্তম জিনিস পেয়েছেন: আল্লাহর সাহায্য ও শাহাদাত, আর মানুষ দুইটি জিনিসের স্বাদগ্রহণ করে থাকে: পরাজয় ও বিছানায় লাঞ্ছনার মৃত্যু। হাদিস শরীফে এসেছে-

في كل قرن من أمتي سابقون

“আমার উম্মতের প্রত্যেক যুগেই কিছু অগ্রগামী থাকে”।

আর আমি দৃঢ় আশাবাদী যে, আবু ওমরও হবেন তাঁদের একজন।

আমি অনেক দ্বিধান্বিত ছিলাম যে, আমি লেখবো কিনা? আমার মত মানুষের পক্ষে কি আবু ওমরকে নিয়ে লেখা সাজে? আমাকে সাহস দিয়েছে আমার সাথী এবং বলেছে, হে আবু মারিয়া! তুমি লেখ; কেননা খোদার কসম! দুনিয়াবাসী এই মহান আক্রান্ত ব্যক্তির কথা ভুলতে বসেছে। প্রিয় ভাইটি সত্যই বলেছে যে, অবাক লাগে একটি নেকড়ে মারা গেলে, একটি হিংস্র সিংহ মারা গেলে বা একটি কুকুর মারা গেলে দুনিয়া জেগে ওঠে, বসে থাকে না। অথচ একজন যমানার মুজাদ্দিদ ইমাম মারা গেলে কেউ তাঁকে স্মরণ করে দেখে না। হে আল্লাহর বান্দারা আমার প্রতি ভুল বুঝবেন না! এর দ্বারা আমি ঐ সকল জাহান্নামের কুকুর আরব তাগুতদের উদ্দেশ্য নিচ্ছি না, যাদেরকে শহীদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এমনটি আদৌ নয়, কেননা শহীদ নামটি আমি এরচেও ঊর্ধে মনে করি যে, তা তাদের কারো মুখে উচ্চারিত হোক; বরং আমার ভর্ৎসনা বরঞ্চ আমার আক্রোশ ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যারা আলেমের বেশভূষা ধারণ করে মিম্বারে আরোহণ করছে এবং সভা ও পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছে। আমার ভর্ৎসনা ঐ সকল ছাত্রদের প্রতি, আমার ভর্ৎসনা ঐ সকল মসজিদসমূহের কারী সাহেবদের প্রতি, আমার ভর্ৎসনা আমার সেই জাতির প্রতি, যাদেরকে তাদের যুগের শ্রেষ্ঠতম লোকেরা ছেড়ে

চলে যাচ্ছে অথচ তারা নিজেদের আরাম-আয়েশের মধ্যেই ডুবে রয়েছে"। (ইরাকের অন্যতম আলেম মুজাহিদ শাইখ আবু মারিয়া আল-কারশি'র প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত)

"ইরাক ও ক্রুসেড যুদ্ধ" সিরিজ থেকে-

(১) আরব উপদ্বীপ এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে অবস্থিত বিদেশী স্বার্থসমূহকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা:

"যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাঁদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে ইরাকের প্রতিবেশী দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন বাহিনী ও মার্কিনিদের মিত্র বাহিনীকে টার্গেট বানানো, যারা নিজেদের ঘাঁটিগুলো থেকে ইরাকে হামলা করার জন্য যাত্রা করছে। কেননা এ বাহিনী এসেছে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, কোন শান্তিপূর্ণ চুক্তি করার জন্য আসেনি। তাদের সঙ্গে চুক্তির দাবি করা মানে ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি করা। আর এমন কোন চুক্তির অনুসরণ করা, যা ইরাক আক্রমণ করার জন্য ঘাঁটিগুলোকে উন্মুক্ত করে দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা ঈমান ভেঙ্গে দেয় এবং উম্মতে মুসলিমাহ তা পূরণে বাধ্য নয়। যেমনিভাবে সরকারি আমলারা ফরজ জিহাদকে বাতিল করণের কোন অধিকার রাখে না; কেননা আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্য হয়ে কোন মাখলুকের আনুগত্য করা জায়েয নেই"।

(ইরাক ও ক্রুসেড যুদ্ধ — পাঠ ও গবেষণা – চতুর্থ পাঠ)

(২) জিহাদই সমাধান:

"মুসলমানরা যখন কুরআন ও অস্ত্র একসাথে ধারণ করবে তখন তাঁরা আল্লাহর দয়ায় ইজ্জত ও নেতৃত্ব হাতে পাবে, যেমনটি বর্তমানে আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, শীশান ও

অন্যত্র বিরাজ করছে। আর এ নেতৃত্ব জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন পথে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না। ইরাকে বাথ পার্টির ঝান্ডা বিলীন হয়ে যাওয়ার পর ক্রুসেডারদের ঝান্ডার সামনে একমাত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহরই ঝান্ডা রয়েছে। তাই সেখানে জিহাদের ঝান্ডাকে শক্তিশালী করা, সাপোর্ট দেয়া ও সহায়তা করা ওয়াজিব। সুতরাং মুজাহিদদের জন্য আবশ্যক হল ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ থেকে হিজরত করে ইরাকের দিকে অগ্রসর হওয়া। যেন ক্রুসেডার ও মৈত্রীবদ্ধ ইহুদী বাহিনীকে প্রতিহত করার সক্ষমতা অর্জন হয়ে যায়”।

(ইরাক ও ক্রুসেড যুদ্ধ — পাঠ ও গবেষণা - পঞ্চম পাঠ)

(৩) মার্কিন বাহিনী কোন চুক্তির জন্য আসেনি:

“ইরাকের কিছুসংখ্যক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন কিছু ঘাঁটিতে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীরা, যেখান থেকে তারা ইরাক আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করছে- মূলত তারা কোন শান্তিপূর্ণ চুক্তি করার জন্য আসেনি। তারা এসেছে যুদ্ধ করার জন্য। যেমনটি আজ ইরাকে মার্কিনিদের অপরাধসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান এবং যেমনটি আজ তাদের এলাকা ভাগ করে নেওয়ার ও সেগুলোতে মার্কিনি ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝা যাচ্ছে। আর এ কথাটিই মার্কিন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্যক্ত করেছে ও নিজেদের কাজের দ্বারা তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। মূলত শান্তিপূর্ণ চুক্তিকারী হচ্ছে সে সমস্ত লোকেরা, যাদের থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ এবং যারা মুসলমানদের থেকে নিরাপদ। আর ঐ সকল মার্কিনিদের থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকেনি; বরং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

যে চুক্তির অনুসরণ করার দ্বারা ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের একটি কারণে লিপ্ত হতে হয়, আর তা হচ্ছে ইরাক আক্রমণ করার জন্য মার্কিনিদের ঘাঁটিগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া এবং যে চুক্তির অনুসরণ করার দ্বারা মুসলমানদের বিরাট সমস্যায় পড়তে হবে এবং কাফেররা প্রথমে ইরাক ও পরবর্তীতে একে একে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেগুলোকে

জবরদখল করার ও সে ভূখণ্ডগুলোতে তাদের শয়তানী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেয়ে যাবে সে চুক্তি তার মূল থেকেই অবৈধ। আর যদি আমরা সরকারি আমলাদের কথামত মেনেও নিই যে, মার্কিনিরা চুক্তিবদ্ধ এবং এ চুক্তি তার মূল থেকে শুদ্ধ, তাহলে আমরা বলব যে, মার্কিনিরা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বৈরিতাপূর্ণ এমন কিছু কাজ করেছে, যার দ্বারা সরকারী আমলাদের দাবিকৃত তথাকথিত চুক্তি ভেঙ্গে গিয়েছে। কেননা চুক্তির চাহিদা হচ্ছে- তারা মুসলমানদের প্রতি তাদের জানমাল ও দ্বীনের ব্যাপারে কোন জুলুম করবে না। আর মার্কিনিরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে সকল জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায় সাধন করেছে তা নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ ইসলামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং তার পরিবর্তে কুফরি গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা ও তা সে অঞ্চলের মানুষদের ওপর ধার্য করে দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম দেশগুলিকে দখল করে নেওয়া এবং সে অঞ্চলগুলোকে নতুন করে পুণর্গঠন করা।

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের প্রতি তাদের জানমাল ও সম্পদসমূহ যেমন- তেলের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা।

চতুর্থতঃ মুসলিম উম্মাহর শত্রু ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

পঞ্চমতঃ ইসলাম, কুরআন ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা।

এ সকল চুক্তি ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর একটিই যথেষ্ট চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। সুতরাং যখন এর সবকটি একসাথে পাওয়া যায় তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে!!?”

(ইরাক ও ক্রুসেড যুদ্ধ – পাঠ ও গবেষণা - পঞ্চম পাঠ)

(৪) কারদাভীর এ কথার খণ্ডন যে, মার্কিনিরা উপসাগরীয় অঞ্চলে চুক্তিবদ্ধ:

“যারা চুক্তির অজুহাতে ঐ সমস্ত মার্কিনিদের সাথে লড়াই করতে নিষেধ করে, যারা ইরাকের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ থেকে ইরাক আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করছে; অথচ তারা স্বীকৃতি দেয় যে, মার্কিনিরা যুদ্ধ করছে, তাদের উচিত তারা যে স্থানে বসবাস করছে কেবল সেদিকেই নজর না দেওয়া এবং মার্কিনিরা সীমিত যে কয়টি চুক্তি রক্ষা করছে কেবল সেগুলোই লক্ষ্য না করা; বরং তাদের উচিত জাতিকে গ্রাস করে নেয়া বিপদসমূহ এবং আফগানিস্তান ফিলিস্তিন ও ইরাকের মুসলমানদের প্রতি জুলুমকারী মার্কিনিদের যুদ্ধ এবং ইরাক যুদ্ধ যে সকল পরিণাম বয়ে আনবে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। যেমনঃ এই অঞ্চলের মানচিত্রে পরিবর্তন আনয়ন এবং সমাজ ও শিক্ষার বিকৃতি সাধন ও এই অঞ্চলে অনাচারী গণতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আর যারা উদাহরণস্বরূপ কুয়েত থেকে ইরাকে হামলা করার জন্য যাত্রাকারী মার্কিন সৈন্যদের হত্যা করা হারাম হওয়ার কথা বলে, আমি ঐ সকল ফতোয়াবাজদের বলবঃ যদি ইরাকের পর তাদের রাষ্ট্রকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় তাহলে কি তখনও তারা বলবে যে, সে সকল মার্কিনিদের হত্যা করা অবৈধ? নাকি তাদের এ বক্তব্য তখন পরিবর্তিত হবে, যখন তারা এ যুদ্ধের আসল চেহারা দেখতে পাবে এবং সরকারী আমলাদের বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ততা গলাধঃকরণ করবে ও হাজার হাজার আহত ও নিহতদের বহর এবং ধর্ম ও নৈতিকতার যুদ্ধ ও নিজের চোখের সামনে দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে দেখবে। ঐ সকল যুদ্ধকারী কাফেররা যখন বুঝতে পারল যে, ইরাকের প্রতিবেশী দেশগুলোতে অবস্থিত তাদের ঘাঁটিগুলোতে তাদের পৃষ্ঠদেশ নিরাপদ রয়েছে, তখন তাদের জন্য নির্যাতিত দেশকে ধ্বংস করে দেওয়া ও তারপর সে অঞ্চলের আরেকটি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার মাধ্যমে নিজেদের পরিকল্পনাকে পূর্ণ করা তাদের জন্য সহজতর হয়ে গিয়েছে। আর এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে, তাদের সাথে লড়াই করা ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা জাতি যে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা অন্যসব ক্ষতিকে নিশ্চিতভাবে ছাড়িয়ে যাবে”।

(ইরাক ও ক্রুসেড যুদ্ধ — পাঠ ও গবেষণা - পঞ্চম পাঠ)